নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে

বাড়ছে অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কা

নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, পেছন থেকে শঙ্কা-আশঙ্কা তত তাড়া করে ধেয়ে আসছে। পরিস্থিতি সুষ্ঠু নির্বাচনের সহায়ক যেমন থাকার কথা তেমন সহজ স্বাভাবিক নেই। সবকিছু মিলে মানুষকে আগাম দুশ্চিন্তা গ্রাস করে চলেছে। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা, বর্তমানের রূঢ় বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা অশুভ জল্পনা-কল্পনা মিলে যে অস্বস্তি জমেছে তা কাটছে না। একদল ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চায়, আরেক দল ক্ষমতায় যেতে চায়। কিন্তু এ চাওয়াটা ক্ষমতার প্রকৃত মালিক জনগণের হাতে সঁপে না দিয়ে আন্তর্জাতিক শক্তি, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের মদদ, টাকা, পেশিশক্তি, প্রশাসন, পুলিশ, সুবিধাপ্রাপ্ত ও সুবিধা বঞ্চিতগোষ্ঠী, মৌসুমি উচ্ছিষ্ট ভোগী, আঞ্চলিকতা, সাম্পদ্রায়িক ভাগবাটোয়ারা, উন্নয়ন ডামাডোল, জোট-মহাজোটিয় তৎপরতা ইত্যাদিতে মশগুল রয়েছে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সরকারি অঙ্গুলি হেলনে পুলিশি নিয়ন্ ণ্ত্রচলে গেছে। সভা-সমাবেশের অবগতি করণকে অনুমতি নেয়ার বিষয়ে পরিণত করেছে। সাবেক প্রধান বিচারপতির লিখিত বই 'স্বপ্নভঙ্গ'-তে ভঙ্গুর বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা ভরসা কতোটা ফিরিয়ে আনতে পারবে তা এ মুহূর্তে ভাবা কঠিন। নির্বাচন কমিশন দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে গেলে যে মানমর্যাদা রক্ষা করে মেরুদণ্ড খাড়া করে চলতে পারে না তা আবারও প্রমাণিত। আমলাতন্ত্রকে গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের কর্মচারী ও জনগণের খাদেম এর জায়গা থেকে সরকার ও সরকারি দলের কর্মচারীতে নামানো হয়েছে। তাদের মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা, কর্মনিষ্ঠা, দেশপ্রেম সবই শাসক দলের প্রতি প্রেম ও নিবেদন এর নিক্তিতে মাপা হচ্ছে। পদ ছাড়াও প্রমোশন হচ্ছে। পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রতিপক্ষ দমন-পীড়নে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করা যায় বিধায় এর ব্যবহার যত বাড়ছে এরা আইনের সীমা তত লঙ্ঘন করে চলছে। গণতন্ত্রের বিধি-নিষেধ, আইনের সীমা, বিচার বিভাগের হুমকি ধামকি, মানুষের মানমর্যাদা, মৌলিক অধিকারসমূহের বেষ্টনী, জনগণের টাকায় চলার বিনয়, চাকরির শর্ত ও নৈতিকতা কোন কিছুই থামাতে পারছে না এদের অপতৎপরতা। যারা এসব করতে চায় না তারাও অসহায়, সৎ আমলা কর্মচারীদের মতো। সরকারি দলকে ঠিকা দিয়ে যারা টিকিয়ে রাখতে পারবে তারাই বড় কাজের বড় ঠিকাদার। প্রকৃত ব্যাবসায়ীদের হাতে ব্যাবসা নেই। আদর্শবাদী এমনকি পেশাদার রাজনীতিবিদদের হাতেও রাজনীতি নেই। পার্লামেন্ট রাজনৈতিক ব্যাবসায় সফল ব্যাবসায়ীদের দখলে। স্থানীয় সরকার নামক সঙ্স্থাটি বাস্তবে শাসক দলের ইচ্ছামাফিক শাসনকার্য পরিচালনার সম্প্রসারিত বাহুরূপে দাঁড়িয়ে আছে। এরা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হয়, শাসক দল কত র্কৃছাঁটাই হয়। এযাবৎ চার শ'র উপরে জনপ্রতিনিধি ছাঁটাই হয়েছে। সাজা নিয়ে এমপি-মন্ত্রিরা বহাল তবিয়তে আছে আর আদালতে চার্জশিট গৃহীত হলেই এদের চাকরি চলে যাচ্ছে। এ সকল নির্বাচনের অভিজ্ঞতা আগামী নির্বাচনের পথের কাঁটা হয়ে আছে। যদিও এগুলি ক্ষমতা বদলের নির্বাচন ছিলো না তাতেই যা, আর ক্ষমতার রদবদলে কীমাত্রা পাবে তাই এ সময়ের ভাবনা।

স্বাধীনতার ৪৭ বছর পার হয়ে গেছে। অথচ আজও আমাদের দেশের শাসকশ্রেণি একটা গ্রহণযোগ ্যনির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। যদিও গোটা সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দুনিয়া জুড়েই গণতন্ত্রের মহাসংকট চলছে। তারপরও উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের বুর্জোয়ারা অন্তত নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তরের ভোট ব্যবস্থাকে গ্রহণযোগ্যতা দিয়ে টিকিয়ে রাখতে পারছে, কিছু কিছু কারচুপির অভিযোগ সত্ত্বেও। বিশাল আত্মত্যাগের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত বাংলাদেশের সব অঙ্গীকার প্রতিশ্রুতিকে পদদলিত করে, পাশ কাটিয়ে এবং বিকৃত করেই আজকের এ পরিণতি ফলের জায়গায় এনে দাঁড় করানো হয়েছে। ১৯৭৩ সাল থেকে ২০১৪ পর্যন্ত ১০টি সংসদ নির্বাচন হয়েছে। তাতে জনগণের ক্ষমতায়নের অর্থে গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? একটা সংসদ নির্বাচন হয় তো একটা সংকটের দিকে দেশ ধাবিত হয়। ১৯৭৩ এর নির্বাচন ২ বছর পার না করতেই সপরিবারে রাষ্ট্রপতি হত্যার মধ ্যদিয়ে দেশ সামরিক শাসনের মধ্যে ্যগিয়ে পড়ল। সামরিক শাসনামলের ১৯৭৯-র সংসদ নির্বাচন এর ৩-৪ বছরের মধ্যেই আরেক রাষ্ট্রপতি হত্যা ও দ্বিতীয় দফায় সামরিক শাসনে দেশ চলে গেলো। সেই সামরিক আমলে ১৯৮৬-তে সংসদ নির্বাচন হলো। ২ বছর টিকলো না। আবার ১৯৮৮ সালে চতুর্থ সংসদ নির্বাচন হলো। ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের তোড়ে সেটা ভেসে গেল। ১৯৯১ সালে পঞ্চম নির্বাচন হলো। ১৯৯৬ সালে এসে দুই টা সংসদ নির্বাচন (ষষ্ঠ ও সপ্তম) প্রায় একই সময়ে করতে হলো। বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার আনা হলো, শাসকশ্রেণির দলসমূহের ক্ষমতা লিপ্সায় তাও প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকলো। ২০০১ সালে অস্টম সংসদ নির্বাচন ২০০৭ সালে এসে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক ডেকে আনলো। ২ বছর পর ২০০৮ সালে নবম সংসদ নির্বাচন চলতে চলতে ২০১৪ সালে ভোটার এবং ভোট ছাড়াই দশম নির্বাচনে ১৫৪ জন সাংসদ নির্বাচিত হলো। শাসকশ্রেণির দুই বুর্জোয়া পক্ষের শক্তি পরীক্ষায় ক্ষমতাসীনরা টিকে গেলো। তারপর থেকে উন্নয়নের বিজলি চমকে মানুষ গণতন্ত্রের প্রেতাত্মা দেখতে দেখতে একাদশ নির্বাচন আসন্ন। তাহলে অতীত অভিজ্ঞতা কী বলে?

শাসকরা সমস্যার মূলে যাবে না। জনগণের ক্ষমতায়ণের লক্ষ্যে নির্বাচন হবে, না দল-গোষ্ঠী-ব্যক্তির ক্ষমতায়ণ হবে? শোষণমুক্তির দিকে দেশ অগ্রসর হবে, নাকি লুটপাটতন্ত্রের পুঁজিবাদকে শক্তিশালী করা হবে। কৃষক, গার্মেন্টস শ্রমিকসহ শ্রমজীবী ও প্রবাসী যে তিন খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নতি তাদের অব স্থাস্উন্নতি হবে, না লুটেরা শ্রেণি পরের ধনে পোদ্দারি করে বগল বাজাবে। ব্যাংক লুট, শেয়ার বাজার লুট, বিদেশে টাকা পাচার চলতে থাকবে, না এর প্রতিকার হবে। রাজনীতি নীতি-আদর্শের উপর দাঁড়াবে নাকি সুবিধাবাদের চক্রে আবর্তিত হবে। বিচার ব্যবস্থা নির্বাহী শক্তির কাছে নত থাকবে নাকি জনগণের শেষ আশ্রয় ও ক্ষমতার ভারসাম ্যরক্ষার স্বাধীনতা পাবে। নির্বাচন কমিশনসহ সকল প্রতিষ্ঠান আইনানুগ ভিত্তির উপর দাঁড়াবে নাকি

শাসকদের চাওয়া মাফিক এডহক ভিত্তিতে চলবে। আমলামন্ত্র কী রাষ্ট্রের কর্মচারী হবে নাকি সরকার ও সরকারি দলের কর্মচারী হবে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে উপনিবেশিক আমলের ধাঁচায় রাখা হবে নাকি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের উপযোগী করে বিন্যস্ত ও পরিচালিত করা হবে। অনুপার্জিত ও অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত ও শাস্তি বিধান হবে নাকি তারাই কর্তৃত্ববান থাকবে।

সারা বছর অসার বাচাল বিতর্কই কি প্রাধান্য পাবে নাকি জনসচেতনতামূলক যুক্তি-তর্ক জবাবদিহিতা-স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা পাবে। বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ অগণতান্ত্রিক আইন যা আছে সেগুলি বাতিল হবে নাকি ডিজিটাল আইনের মতো একটার পর একটা আমদানি হতে থাকবে। এগুলো নিয়ে ভাবনা নেই।

সারা বছর লুট কর, নির্বাচনে বিনিয়োগ কর–এই কাজে যারা যত অগ্রগামী বুর্জোয়া প্রধান দলসমূহের কাছে তারা তত দামি। এখন ২০১৪ সালের মতো অর্থাৎ দশম সংসদ নির্বাচনের মতো এমন খোলামেলা জালিয়াতি সম্ভব নয় বিধায় ইভিএম নতুন মডেলের কারুকাজের ভাবনা যেমন চলছে তেমনি এচক্রান্ত মোকাবিলার আকার আয়োজনেরও নানা সমীকরণ চলছে। এখন প্রশ্ন দশটি সংসদ নির্বাচন যে কারণে জনগণের প্রত্যাশাপূরণ করতে পারেনি সে কারণসমূহ দূর করার লক্ষ্যে দেশবাসীকে এগিয়ে আসতে হবে। নীতি-আদর্শের ভিত্তিতে রাজনীতিকে পুনর্গঠিত করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা তথা জনগণের ক্ষমতায়ণের গণতন্ত্র, শোষণমুক্ত সমাজের জন্য সমাজতন্ত্র, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্ম ব্যবসার বিষাক্ত ছোবল ও হানাহানি থেকে মুক্ত থাকার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবমুক্ত স্বাধীন জাতীয় বিকাশের জন্য জাতীয়তাবাদ এর বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে। জনগণের প্রত্যাশা মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাসদ অবিচলভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে দলীয় ও জোটগতভাবে। অপরাপর গণতান্ত্রিক, দেশপ্রেমিক দল ও জোটকে বর্তমান সরকারের দুঃশাসন থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করে গণতন্ত্র, ভোটাধিকার ও ভাত-কাপড়ের সংগ্রামে যার যার অবস্থান থেকে ঐক্যবদ্ধ যুগপথ আন্দোলনে নামতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা–সাম্য, সামাজিক সুবিচার, মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাসদকে শক্তিশালী করুন। অবাধ নিরপেক্ষ পরিবেশে গ্রহণযোগ্য-অংগ্রহণমূলক নির্বাচন হলে মই প্রতীকে ভোট দিয়ে বাসদ প্রার্থীদের ও অন্যান্য বাম দলের প্রাথীদের জয়যুক্ত করুন। ভেতরে-বাইরে আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধির সংগ্রামে শামিল হোন।